‘বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি সহায়ক চুক্তি’ লিমা ঘোষণা জলবায়ু বিপন্নতা বাড়াবে নিজেদের অর্থেই বাস্তবায়ন করতে হবে আমাদের জলবায়ু পরিকল্পনা

১. জলবায়ু আলোচনায় ধনী দেশগুলোর কৌশল এবং ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর স্বার্থ বিপন্ন

গত ০১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ পেরুর রাজধানী লিমাতে ইউএনএফসিসিসি'র (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) ২০তম কপ (COP- Conference of the Parties) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের শীর্ষ প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ প্রায় কয়েক হাজার মানুষ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন বিশেষ করে প্রতি বছরের মতই জলবায়ু বিষয়ক ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারনের বিষয় নিয়ে। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় মেয়াদের (২০২০ পরবর্তী সময়কালের জন্য) চুক্তির রূপরেখা চূড়ান্ত করা, যা প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য কপ-২১ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হবে।

কিন্তু আমরা অত্যন্ত আশাহত এবং উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, এই আন্তর্জাতিক আলোচনায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২º সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হারে কার্বন নির্গমন হ্রাসে ধনী দেশগুলোকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করা এবং একটি আইনী বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে গত কয়েক বছর ধরে যে মূল আলোচনা চলছিল তা একরকম ব্যর্থ হতে চলছে।

২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে ধনী দেশগুলোকে যাতে কোন আইনী বাধ্যবাধকতায় আসতে না হয় তার জন্য এমন সব কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে, যা দেখে আমরা বিস্মিত। এই কৌশলের কারনেই ইতিমেধ্যে কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলো নিজেদের দায় (ঐতিহাসিক এবং ভবিষ্যত উদগীরনের দায়) এড়াতে সক্ষম হয়েছে এবং ভবিষ্যত কার্বন উদগীরন হ্রাসের বিষয়টি আমাদের মত স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষতি বহনের পাশাপশি আমাদেরকেও তাদের চাপিয়ে দেওয়া শর্তানুযায়ী কার্বন উদগীনর হ্রাস করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে নিজেদের র্অথনৈতিক উন্নয়ন ও টিকে থাকার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে হতে পারে।

আজকের সংবাদ সম্মেলনে আমরা বিশ্বনেতৃবৃন্দের এই অন্যায্য কৌশলী অবস্থানের বিরোধিতা করছি এবং আমরা বলতে চাই, বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস এবং জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বিপন্নতা রোধ করার জন্য বিশ্ব নেতুবৃন্দকে আরও আন্তরিক হতে হবে। এ দিক থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনা “লিমা ঘোষণা” ন্যায়বিচারের পরিপন্থী এবং জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে এক ধরনের উপহাস।

স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ বাংলাদেশকে অবশ্যই প্রভাবিত করে। সে প্রেক্ষিতে কপ-২০'র গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে শুধুমাত্র যেসব বিষয়ে আমাদের স্বার্থসংশ্লিষ্টতা রয়েছে সে বিষয়ে আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে চাই।

২. INDC 'র আড়ালে ধনী দেশগলোর কার্বন হ্রাসের দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে

লিমা সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির খসড়া শর্তসমুহ প্রণয়ন করা যেখানে কার্বন উদগীরন হ্রাসের বিজ্ঞান ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে এবং ধনী দেশগুলো একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে ২০২০ সালের পর থেকে তা অনুসরন করবে এবং অর্জন করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল লিমা খসড়ায় ধনী দেশগুলো বিজ্ঞান ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনের পরিবর্তে কার্বন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারন করার শর্ত যুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তারা কথিত INDC (Intended Nationally Determined Contribution) নামক একটি কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। IPCC (Inter Governmental Panel for Climate Change)'র সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে বলা হয়েছে যে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২º সেলসিয়াসের নীচে রাখতে হলে ধনী দেশগুলোকে ২০৫০ সালের মধ্যে অবশ্যই ৭০-৯০% কার্বন উদগীরন হ্রাস করতে হবে। ধনী দেশগুলো IPCC 'র এই লক্ষ্যমাত্রা এড়ানোর উদ্দেশ্যে বিগত সম্মেলনে (কপ-১৯) INDC শর্ত যোগ করে এবং তা আরও জোড়ালো করার জন্য কপ-২০ সম্মেলনের পূর্বেই বিশেষ করে আমেরিকা, চীন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্বন হ্রাসের তথাকথিত লক্ষ্যমাত্রা ঘোষনা করে।

আমরা নাগরিক সমাজ পূর্ব থেকেই এই INDC'র বিরোধিতা করে আসছি। কারন এর ফলে কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলোকে কার্বন হ্রাসের বাধ্যতামূলক লক্ষ্যমাত্রা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার একটা চক্রান্ত করা হচ্ছে যা আমরা লিমায় দেখতে পাচ্ছি। যদিও বলা হচ্ছে শর্ত অনুসরন করে আগামী মার্চ'২০১৫ সালের মধ্যে সকল দেশ তাদের কার্বন হ্রাসের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা UNFCC'তে জমা দিবে এবং তার ভিত্তিতেই চুক্তি হবে, কিন্তু বাস্তবতা বলে দিচ্ছে এক্ষেত্রে ধনী দেশগুলো তাদের পূর্বে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে একটুও অগ্রসর হবে না, বরং উল্টো আমাদের মত স্বল্পোন্নত জলবায়ু আক্রান্ত দেশগুলোর উপর কার্বন হ্রাসের সাধ্যাতীত লক্ষ্যমাত্রা চাপানোর চেষ্টা করবে। এই অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক শর্তই আগামী ২০১৫ সালের প্যারিস প্রোটকলে যুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যার ফলে ২০২৫ সালে কার্বন নিঃসরন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না বলে আমরা নাগরিক সামজ আশংকা করছি। সুতরাং INDC শর্ত সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না কারন এর সংকীর্ন সংজ্ঞা শুধুমাত্র প্রশমনের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে, অভিযোজন এবং অর্থায়নের বিষয়সমুহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নাই। আগামী মার্চ'২০১৫ তে কার্বন হ্রাসের যে লক্ষ্যমাত্রা UNFCC'তে জমা দিতে হবে, তা বিজ্ঞান ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এনেক্স দেশগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক হতে হবে এবং নন-এনেক্স দেশগুলোর জন্য ভলান টারী বা স্ব-প্রণোদিত দায়িত্ব হতে হবে। এর বাইরেও লিমা খসড়ায় INDC'তে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশল নির্ধারনের ক্ষেত্রে সকল দেশের করনীয় বিষয়সমূহ উপস্থাপন করতে হবে। এবং সেখানে ধনী দেশ ও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য

করণীয়, বিশেষ করে, অভিযোজন এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বও প্রকাশ করতে হবে।

৩. সবুজ জলবায়ু তহবিল: মুনাফা মূখ্য হওয়ায় অর্থায়নের গতি শ্লথ

উন্নত দেশগুলোর ২০২০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি সুদূর পরাহত এক স্বপ্নই থেকে গেছে। কপ-২০'তে ২৯টি দেশ মিলে সবুজ জলবায়ু তহবিলে ১০.২ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা খুবই নগণ্য। কারণ, UNFCC'র হিসাব অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল বৈশ্বিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য বছরে প্রায় এক ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলার প্রয়োজন হবে। কপ-২০'তে ধনী দেশগুলোর পক্ষ থেকে অর্থায়নের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা মূলত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, কিন্তু বাস্তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষ থেকে ধনী দেশগুলোর উপর কার্যকর চাপ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে ধনী দেশগুলো জলবায়ু অর্থায়নের কানকুনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। এমনকি এক পর্যায়ে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও অর্থায়নের জন্য চাপ প্রয়োগের চেষ্ট করছে।

দ্বিতীয়ত একটি বিষয় অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্যণীয় যে, ধনী দেশগুলোর মুনাফা-তাড়িত কৌশল সবুজ জলবায়ু তহবিলে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হিসাবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানির প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য ধনী দেশগুলোর অব্যাহত চাপের কারণে ভবিষ্যতে এ তহবিলে আশানুরূপ অর্থায়নের বিষয়ে যথেষ্ঠ সন্দেহ রয়েছে।

তারপরেও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত অনেক দেশ ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে তাদের অভিযোজন ও প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। কিন্তু ধনী দেশগুলোর ঐতিহাসিকভাবেই দায় রয়েছে এই অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা, কারণ তারাই এজন্য দায়ী। এ প্রেক্ষাপটে সবুজ জলবায়ু তহবিলে অর্থায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে সোচ্চার হওয়ার সুযোগ এখনও আমাদের হাতে রয়েছে যা ২০১৫ প্যারিস চুক্তিতে যুক্ত হতে পারে। যেমন;

সবুজ জলবায়ু তহবিলে ধনী দেশগুলোকে অবশ্যই তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং তা হবে সরকারীভাবে বরাদ্দকৃত, পূর্ব অনুমানযোগ্য এবং বর্তমান উন্নয়ন সহযোগিতার অতিরিক্ত। কপ-২০ তে ধনী দেশগুলো যে ১০.২ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আমরা আশা করব অতি দ্রুত এই প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

- জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০% অর্থ অভিযোজনের জন্য বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। যদিও এ বিষয়ে লিমা খসড়াতে ৫০% অর্থ বরাদ্দের বিষয় নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। স্বল্পোন্নত ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমুহকে অভিযোজন কর্মসুচি বাস্তবায়নের জন্য সবুজ জলবায়ু তহবিলে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- ধনী দেশগুলো এখন পর্যন্ত শুধু প্রতিশ্রুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কাজেই প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে দুরত্বের ফলে যে ক্ষতি হবে তা নিরূপণ এবং সে অনুসারে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ক্ষয়-ক্ষতি (Loss & Damage) সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি: বাংলাদেশের প্রধান লবিংয়ের ক্ষেত্র, কিন্তু অর্জন শূন্য

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে কপ-২০ সম্মেলনের শুরু থেকেই আশাব্যঞ্জক কিছু অর্জনের কথা আমরা শুনে আসছি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে অভিযোজন কর্মসূচির বাইরেও (Beyond Adaptation) অনেক ক্ষয়ক্ষতি মোকবেলা করতে হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে । কিন্তু অত্যন্ত হতাশার বিষয় যে, জলবায়ু আলোচনায় এ বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি এমনকি কোন প্রকার নতুন কার্যধারাও লিমা খসড়াতে যুক্ত করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, বিগত জলবায়ু আলোচনায় (কপ-১৯) ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে কাজ করার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল এই কমিটির প্রস্তাবনা আগামী ২০১৬ সালে পর্যালোচনা করা হবে এবং তার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক কার্যপ্রণালী প্রণীত হবে। এ কারণে কপ-২০ জলবায়ু আলোচনায় বিগত আলোচনার সিদ্ধান্তই অনুসরন করা হয় এবং নতুন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় আমরা আশাহত। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো ২০১৬ সাল পর্যন্ত যত ক্ষতির শিকার হবে তার কোন দায় দায়িত্ব ধনী দেশগুলোর নাই। কারণ, তারা তথাকথিত একটি কমিটির কথা তুলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর স্বার্থ তিন বছর পিছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৬ সালের পরেও ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব হবে কিনা আমাদের আশংকা রয়েছে।

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে কোন নতুন চুক্তি বা ধারা সংযুক্ত করা সম্ভব হবে না। কিন্ত বাংলাদেশের এ বিষয়ে প্রস্তুতি থাকা উচিৎ। কারন এর উপকারভোগী অথবা ভুক্তভোগী হিসেবে বাংলাদেশ প্রভাবিত হবে। ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি আগামী মার্চ ২০১৫ এর মধ্যেই তাদের দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা UNFCC'র কাছে জমা দিবে। স্বল্পোন্নত এবং জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হবে এই কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়ার্ক কী হবে তা নির্ধারণে ভুমিকা রাখা। ২০১৫ পরবর্তী সময়ে ক্ষয়ক্ষতি বা Loss & Damage বিষয়ে বৈশ্বিক সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ, পরিমাপণ ও অর্থায়ন পদ্ধতি এবং এর দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে কাজ করা দরকার।

৫. কপ-২০ তে বাংলাদেশের সরকারী প্রতিনিধি দলের ভূমিকা

কপ-২০'তে জলবায়ু সমঝোতা আলোচনায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের ভূমিকা বাংলাদেশের শক্তিশালী অবস্থানকে কিছুটা হলেও ক্ষুন্ন করেছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জলবায়ু আলোচনার ক্ষেত্রে বিগত পাঁচ বছরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে জলবায়ু সম্মেলনগুলোতে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধির অংশগ্রহন, কপ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন এবং দলমত নির্বিশেষে আমাদের অর্জন নিয়ে আলোচনা ও পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হত। পাশাপাশি পুরো প্রক্রিয়াতে নাগরিক সমাজের এবং গণমাধ্যমে অবাধ প্রবেশাধিকার ও অংশগ্রহণ ছিল। যার ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ নিশ্চিত করা যেমন সহজ ছিল তেমনি এ বিষয়ে সবার মধ্যে এক ধরনের সচেতনতাও তৈরি হয়।

কিন্তু এবারের সম্মেলনে সরকারের সাথে দেশে এবং দেশের বাইরে নাগরিক সমাজের ব্যাপক কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না, কোন বিশেষজ্ঞ প্যানেলও সংযুক্ত করা হয় নাই এবং প্রতিনিধি দলের আকার ছোট করা হয়েছে। পরবর্তীতে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে দুজন সদস্য যোগ করা হলেও আমরা মনে করি, বিশেষজ্ঞ প্যানেল যুক্ত না

করায় এবং বিগত পাঁচ বছর যাবৎ এই প্রক্রিয়ায় যুক্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত না করায় রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অর্জিত লব্ধ-জ্ঞান জলবায়ু আলোচনার কোন পর্যায়ে কোন কাজেই লাগানো যায় নাই। ফলস্বরূপ বিগত আলোচনাগুলোতে আমাদের যে শক্তিশালী অবস্থান ছিল তা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে। তাছাড়া নিম্নোক্ত কারনে এবারের সরকারী প্রতিনিধি দলের ভূমিকা অনেক দুর্বল মনে হয়েছে যা আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল;

- প্রথমত, কপ-পূর্ব সময়েই আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে দাবি করেছিলাম যে, সরকার জলবায়ু সম্মেলনে কী অবস্থান নিতে যাচ্ছে সে বিষয়টি জনগণের কাছে প্রকাশ করা, কিন্তু তা করা হয়নাই। এমনকি সম্মেলন চলাকালে সরকারী প্রতিনিধিরা আদৌও কোন সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিয়েছে কিনা তা আমরা জানতে পারিনাই।
- সরকারী প্রতিনিধিগনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, বিশষ করে কপে অংশগ্রহনকারী বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা করলেও অতীতের মত কোন প্রকার দায়িত্ব দেওয়া হয়নাই এবং কোন সমন্বয় সভা করা হয়নাই। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা নিজেদের উদ্যোগে কিছু করলেও তা সরকারের প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বিত করা সম্ভব হয়নাই।
- সরকারী প্রতিনিধিগন কপে কী করছেন এবং তাদের অবস্থান, অগ্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে সাংবাদিকদেরকেও তেমন কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নাই।

উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে জলবায়ু আলোচনা থেকে বাংলাদেশকে কোন সুবিধা নিতে হলে তা অবশ্যই একটি কার্যকর জন-অংগ্রহনমূলক প্রক্রিয়া অনুসরনের মাধ্যমে হতে হবে। কিন্তু নাগরিক সমাজকে বিয়োজন করে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কতটা লাভবান হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান প্রতিনিধি দলকে এটি অনুধাবন করতে হবে এবং আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আহবান জানাই, সরকার বিশেষ করে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে তার অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে এবং ভবিষ্যত আলোচনার ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে। এতে সরকারের হাতই শক্তিশালী করা হবে বলে মনে করি।

৬. নাগরিক সমাজের ভূমিকা

আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে লিমা জলবায়ু সম্মেলন নিয়ে পূর্ব থেকেই সক্রিয় ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি। এবারও আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আমাদের ও সরকারের অবস্থানের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছি এবং এ বিষয়ে লিমা সম্মেলনের পূর্বে বাংলাদেশে সংবাদ সম্মেলন এবং সেমিনার করে জলবায়ু আলোচনায় আমাদের দাবি উত্থাপন করে সরকারকে জানানোর চেষ্টা করেছি।

এ ছাড়াও আমরা লিমাতে দুটি সংবাদ সম্মেলন করেছি। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমুহ দাবি করে আমরা সংবাদ সম্মেলন করি এবং সেখানে ফিলিপাইন, কেনিয়া এবং যুক্তরাজ্যের নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ অনেকেই অংশগ্রহন করেন এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দাবির প্রতি সংহতি ও একাত্মতা ঘোষনা করেন।

৭. কপ ২০ থেকে সুবিধা পেতে বাংলাদেশের যা করণীয়

আন্তর্জাতিক জলবায়ু সমঝোতায় বাংলাদেশের স্বার্থ মূলত দুটি। ক. গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরন কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা নমনীয় রাখা, যাতে আমাদের ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত না হয়। লিমা খসড়ায় ধনী এবং দরিদ্র সকল দেশকেই কার্বন উদগীরন হ্রাসে দায়িত্ব নিতে হবে এবং আগামী মার্চ ২০১৫-এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা জমা দিতে হবে। খ. জলবায়ু পবির্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিশেষ করে প্রশমন ও অভিযোজন উভয় ক্ষেত্রেই আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। কিন্ত সমস্যা হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের প্রস্তুতি দুর্বল। কারন এসকল বিষয়ে তেমন কোন গবেষনা ও প্রয়োজনীয় তথ্য নাই। বিশেষ করে, ভবিষ্যত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ, সে প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন সেক্টরে কার্বন উদগীরনের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাণ এবং এসকল বিষয় বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা। পর্যাপ্ত তথ্য ও প্রস্তুতির অভাবে, সামনের জলবায়ু বিষয়ক আলোচনাগুলোতে ধনী দেশগুলো বাংলাদেশকে কুটনৈতিক সমঝোতার ফাঁদে ফেলতে পারে, যার খেসারত দিতে হতে পারে বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও যৌক্তিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে। সূতরাং বাংলাদেশকে সতর্ক থাকতে হবে বিশেষ করে একটি ভাল প্রস্তুতি ভবিষ্যত দরকষাকষিতে আমাদেরকে অনেক এগিয়ে রাখতে পারবে। আমরা ভারত, দঃ আফ্রিকার ক্ষেত্রে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি। প্রস্তুতি বিষয়ে বাংলাদেশের অনেক করণীয় রয়েছে, যেমন;

<u>আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে</u>

ক. বাংলাদেশকে কার্বন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা UNFCC'র কাছে জমা দিতে হবে। কাজেই আমাদের কার্বন উদগীনরকারী সেক্টরসমুহের উপর একটি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। উন্নেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রায় সব সেক্টরই কার্বণ উদগীরনকারী হলেও এনার্জি, পরিবহন এবং কৃষিখাত ধনী দেশগুলোর প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত। সুতরাং এসকল সেক্টরের কার্বন উদগীরণের উপর দ্রুত গবেষণা ও তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে INDC প্রণয়ন করলে তা বাংলাদেশকে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থায় নিয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি।

দ্বিতীয়ত, কার্বন উদগীরন হ্রাসে INDC শর্ত সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। এটা হবে এনেক্স দেশগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক ও বিজ্ঞানভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রানির্ভর এবং নন-এনেক্স দেশগুলোর জন্য ভলান্টারী বা স্বপ্রণোদিত দায়িত্ব। দায়ী দেশগুলোর জন্য কার্বন হ্রাসে Commitment না Contribution তা নির্ধারনের সুযোগ এখনও আমাদের কাছে রয়েছে এবং বাংলাদেশকে এ বিষয়ে জোর দিতে হবে। বাংলাদেশের মত দেশগুলোকে যদি INDC প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করতেই হয় তাহলে সেখানে বৈশ্বিক সহায়তার কৌশল কী হবে বিশেষ করে কারিগরী ও আর্থিক বিষয়ে পরিষ্কার অবস্থান থাকতে হবে এবং প্যারিস প্রটোকলে তার পরিষ্কার উল্লেখ থাকতে হবে।

খ. অর্থায়নের বিষয়েও বাংলাদেশকে প্রস্তুত থাকত হবে। সবুজ জলবায়ু তহবিলসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে টাকা প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশের কোন প্রস্তুতি আছে কিনা তা এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কারন টাকা প্রাপ্তির জন্য National Designated Authority (NDA) নির্বাচন করা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও বালাদেশে এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন প্রতিনিধি/সংস্থা নির্বাচন করা সম্ভব হয় নাই এবং তাদের কোন প্রস্তুততিও আছে বলে আমরা জানি না।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক তহবিলসমুহের বিভিন্ন বোর্ডে সদস্য হবার জন্য বাংলাদেশের চেষ্টা করা উচিৎ। ভারত ও চীন এ বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে এবং তারা

এসব তহবিলের বড় উপকারভোগী এবং বিভিন্ন প্রকল্প দিয়ে তহবিলের বেশিরভাগ অর্থ তারাই হাতিয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিনিধিত্ব করলেও এসকল দেশের জন্য গঠিত তহবিলে (এলডিসি ফান্ড, এডাপটেশন ফান্ড ইত্যাদি) আমাদের কোন প্রতিনিধিত্ব নাই।

গ. বাংলাদেশে তার স্বার্থসমুহ সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফেরামকে ব্যবহার করা এবং তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে LDC (Least Developed Countries) ও CVC (Climate Vulnerable Forum) ফোরামে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। এর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের উপর বাস্তব চিত্র বৈশ্বিকভাবে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের কাজ করতে হবে।

ঘ. তবে উপরোক্ত বিষয়সমুহে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হলে এ মুহুর্তে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গতিশীলতা সৃষ্টি করা জরুরি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দরকষাকষি প্রকৃত অর্থেই একটি জটিল বিষয় এবং বিশ্বের সকল দেশই এ বিষয়ে সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে থাকে। আমাদেরকেও তা করতে হলে সরকার, নাগরিক সমাজসহ সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। আমরা বর্তমান নেতৃত্বের নিস্পৃহতা দেখে শংকিত যে তারা বিষয়টি অনুধাবন করত ব্যর্থ হচ্ছে এবং বিষয়টিকে অবহেলা করছে।

জাতীয় পর্যায়ে করণীয়

সর্বোপরি আমরা মনে করি বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতি ও মুনাফা-তাড়িত কৌশলের কারণে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক অর্থায়ন নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই দূরুহ হতে পারে। আমাদেরকে সে বিষয়টি অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এবং বিকল্প কৌশলও নির্ধারন করতে হবে যাতে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর টিকে থাকার সামর্থ্য অর্জন করা যায়। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ সরকারের কৌশলের মধ্যে বিবেচনা করা যেতে পারে;

ঙ. জাতীয় জলবায়ু কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমাদের দাতা সংস্থার অনুদানের জন্য অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। নিজের অর্থায়নেই তা করতে হবে। আমাদের বাৎসরিক ২২ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব এবং ১৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি রেমিট্যান্স উৎস রয়েছে, সেখানে মাত্র ১.২ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা বা শিথিল ঋণের জন্য বসে থাকার কোনও যুক্তি নেই।

চ. এমনভাবে জলবায়ু সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে অনুদানের প্রতি কোনও নির্ভরতা না থাকে। রাজস্ব আয় বাড়িয়ে, প্রশাসনিক ব্যয় যৌক্তিক করে এবং দুর্নীতি নির্মূল করলে অবশ্যই জলবায়ু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমাদের বহিঃনির্ভরতা ১০০% হ্রাস পাবে বলে আমরা মনে করি।

ছ. উপকূলীয় এলাকাকে জলবায়ু প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারকে অবশ্যই সমন্বিত এবং লাগসই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু তাড়িত নগরমুখী ছিন্নমূল মানুষকে জায়গা দিতে নগরগুলোকে প্রস্তুত করতে হবে, নয়ত তাদের জন্য গ্রামে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

জ. বিসিসিএসএপি কে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে এবং একে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে এবং অগ্রাধিকার করণীয় নির্ধারন করতে হবে। উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাজিত নীতি ও মতবাদ থেকে সরে এসে বিপদাপন্ন জাতিকে জলবায়ুজনিত নেতিবাচক প্রভাব ও ভবিষ্যত বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য একসাথে কাজ করতে হবে।

ঝ. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং কর্মসুচি বাস্তবায়নে পাহাড়ী এলাকা এবং এর জনগোষ্ঠী ও বাস্তুসংস্থান (Ecosystem) ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং সে অনুসারে কর্মসুচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঞ. জলবায়ু পরিকল্পনা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে একটি দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সম্পদ সমাহরন, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং সহ সকল বিষয় সুষ্ঠূভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে "জাতীয় জলবায়ু কমিশন" গঠন করা যেতে পারে।

চ. সর্বপোরি বাংলাদেশে যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাবগুলো হচ্ছে তার বাস্তব চিত্র বৈশ্বিকভাবে তুলে ধরার জন্য কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৃথিবীব্যাপী দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে প্রচার করতে হবে যাতে বিভিন্ন দেশের নেতৃত্ব ও কুটনীতকিদের মধ্যে আমাদের শুভাকাংখী তৈরী হয়। "জলবায়ু দূতিয়ালীকে" (Climate Diplomacy) সামনে নিয়ে আসতে হবে এবং 2nd Track Diplomacy'র জন্য নাগরিক সমাজকেও সাথে নিতে হবে।

সচিবালয়: বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন: ০২-৮১২৫১৮১, ৯১১৮৪৩৫, ফ্যাক্স: ০২-৯১২৯৩৯৫,
ইমেইল: info@equitybd.org ওয়েব: www.equitybd.org